করাতী

ফয়জুম ইসলাম

মা যখন মারা যায় তখন কাশেমের বয়স ছ'বছর মতো। মা'র সাথে নির্ভরতার সম্পর্ক মা'র মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতের স্মৃতি-সবই কাশেমের কাছে অস্পষ্ট। তার বাবা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলো অনেক পরে। মধ্যবর্তী সময়ে তাদের চার ভাইকে মানুষ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলো বড়বু-তাদের চাচাত বোন। বড়বু'র মুখেই কাশেম শুনেছ মা'র অনেক গল্প। এভাবে সামান্য স্মৃতি এবং গল্প নিয়ে মা'র একটি অস্পষ্ট অবয়ব তার মনে তৈরী হয়েছিলো। বড়বু আর নতুন মা'র সাথে ক্রমান্বয়ে তার নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো বটে কিন্তু আজ এই চল্লিশ বছর বয়স থেকে পেছনে তাকালে দেখা যায়, সে সম্পর্ক ছিলো কতই না অসম্পূর্ণ! মা কেন তাকে রেখে হারিয়ে গেলো-বিশ্বসংসারের ওপর এই অভিমান নিয়ে একসময় মা'র কবরের শিথানে বেড়ে ওঠা কাঁঠাল গাছটিকে সে নতুন চোখে লক্ষ্য করে। কাশেমের মনে হয়েছিলো, গাছটির শরীরে তার মা'র শরীরের অংশ রয়েছে। মা'র শরীর মিশে যাওয়া মাটিতেই যে গাছটির শিকড়ের বিস্তার। তারপর থেকে কাশেম আর গাছটির কাঁঠাল খায়নি; কাউকে তা খেতে দেখলে তার বীভৎসই লেগেছে। আর গাছটি হয়ে উঠেছে মা'র স্মৃতির মতো, স্ত্রী বা সন্তানদের মতো জরুরী একটি অবলম্বন যার দিকে তাকিয়ে সে তার অবসর কাটিয়ে দিতে পারে। এখন মেঝো ভাই কিনা সেই কাঁঠাল কাছটিকে বিক্রি করে দেবার কথা তুলছে।

ভাদরের ধারার ভেতর ভাগচাষের ইরি ধানের জমিতে সারা দিন সার ছিটিয়েছে কাশেম। নদীতে স্নান করে ঝরঝরে মন নিয়ে সে হেঁসেলে ঢুকে ভাত খেয়েছে; তার স্ত্রী পাখির সাথে করেছে বিস্তর খুনসুটি। মাটির বারান্দার মুক্ত প্রান্তে দ-হয়ে বসে তারপর কাশেম বিড়ি ধরিয়ে শেষ বিকেলের আকাশে দেখছে হলুদ আলো আর কখনও জলদ মেঘ। একটু পরে মাগরেবের নামাজ পড়ে সে যাবে অনতিদূরের খালপাড়ে বাবুর মুদীখানায় আড্ডা দিতে। সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা না দিলে দিনটিকে কেমন অসম্পূর্ণ মনে হয়। বিড়ি মাঝামাঝি এসেছে— এমন সময় মেঝোভাই হন্তদন্ত হয়ে আঙিনায় ঢুকেছিলো; কাপড় মেলে দেবার তারে দ্রুত ভেজা লুঙ্গি নেড়ে দিতে দিতে অদৃশ্য বড় ভাইকে হাঁক দিয়ে ডেকেছিলো; 'বড় ভাই। কোনো আপনে? শিগগির আসেন। এহনই আলাপখেন সারে লেই।'

আঙিনার উত্তরে মাটির ঘর থেকে লুঙ্গি কষে বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এসেছিলো বড় বাই, 'এত তাড়া কি কামে?'

'মাগরেবের ওয়াক্ত হয়ে আলো তো। জাবারে যাওয়া লাগিব না! মেলা কাম রয়েছে।'

এতসব কথার ভেতর কাশেম আরামে বিঁড়ি টানছিলো। উঠোনে ছোট একটি কাঠের টুলে বসে বড় ভাই গান ধরেছিলো মধুমালা পালার। সুখটান দিয়ে বিড়িখানা ছুঁড়ে ফেলে বিয়েছিলো কাশেম। কাপড় পাল্টে মেঝো ভাই চিরুনি দিয়ে চুল আচড়াতে আঁচড়াতে বড় ভাইয়ের সম্মুখে আরেকটি টুল পেতে বসে বলেছিলো, 'বুঝলু কাসেম! জলির একখেন ভালো সম্বন্ধ আইছে। তোক তো কইছি।'

জলি মেঝো ভাইয়ের সব চেয়ে ছোট মেয়ে মেঝো ভাইয়ের এই একটি মেয়ের বিয়েই কেবল বাকী। এবার জলির বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে পূবপাড়ার বতর মোল্লার ঘর থেকে। পাত্র বদর মোল্লার মেঝো ছেলে। বাজারে সে একটি মনোহারী দোকান চালায়। তার রোজগার মন্দ নয়। কাশেম তাই মেঝো ভাইয়ের সাথে একমত হয়েছিল, 'সে তো শুনলেমই! তা'লি পরে আর দোনোমনা করে লাভ কি? তুমি আগাবের পারো।'

সে আবার মেঝো ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'শামসুক কইছেও?' সামসু তাদের ছোট ভাই। ইউনিয়ন পরিষদের জনৈক মেম্বারের কাছে সামসু গেছে কাজে।

'হ। শামসুক কইছি। সেও মতো দেছে।'

মেঝে ভাইয়ের কণ্ঠে স্পষ্ট গভীর চিন্তার সুর। যেন স্বগতোক্তি করেছে— এভাবে মেঝো ভাই মাথা নীচু করে বলেছিলো, 'বিয়ে তো দেবো! কিন্তুক কিছু দেয়া-থুয়া লাগিব না!' তারপরই মেঝো ভাই গোরস্থানের কাঁঠাল গাছটি বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলো। চার ভাইয়ের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন ছিলো কেননা দাদা, দাদি, মা, বাবা এবং সৎ মা'র কবর নিয়ে গড়ে উঠা দু'কাঠা মতো জমির পারিবারিক গোরস্থানটি এখন পর্যন্ত তাদের যৌথ সম্পত্তি।

যৌথ সম্পত্তি কাঁঠাল গাছটি বিক্রি করবার মেঝো ভাইয়ের প্রস্তাবটির অবশ্যম্ভাবিতা কাশেমের ভালো লাগে না। বাবা মারা যাবার পর তারা চার ভাই পরস্পরের মধ্যে বাবার জমি ভাগ করে নিয়েছে। সৎ মা মারা যাবার আগে তাদেরকে তার জমি বন্টন করে দিয়েছিলো। এভাবে তারা প্রত্যেকে মাত্র চার কাঠা মতো জমির মালিক। নিজস্ব ফসলে সংসার চলে না বলে তাদেরকে ভাগচাষ করতে হয়। মহাজনদের খাতায় প্রত্যেকেরই ঋণের পরিমাণও বেড়ে চলেছে ক্রমশ। জমি বিক্রি করলে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না— কাজেই সংসারের বিভিন্ন ঠেকাবেজায় বসতভিটা বা ক্ষেত্রে আলে লাগানো মূল্যবান গাছগুলো তাদেরকে বিক্রি করতেই হয়। কিন্তু গোরস্থানের কাঁঠাল গাছটি কেন? বেচতে বেচতে মেঝো ভাইয়ের মালিকানার আর কোনো গাছ অবশিষ্ট নেই বলে? কাশেম বিচলিত হয়। এই গাছ যে তার বড় আপন।

ধ্বংস আটকাবার জন্য ক্যাশেম এখন সচেষ্ট, 'এজমালি সম্পত্তির এই একখেন গাছ কেবল বেচা বাকী রয়েছে। এই হারে বেচপের থাকলি পরে বিটেত আর কুনো গাছ থাকবি না নে। ছাওয়াল - পাওয়াল ইট্টু ফল-টল খাবিনি কোন থেন?

কথা শুনে খেঁকিয়ে ওঠে বড়ো ভাই, 'জান বাঁচে না। আবার তোর ফল খাওয়া।'

কাশেম অনুমান করে হয়তো বা এই মুহূর্তে বড়ো ভাইয়েরও নগদ টাকার প্রয়োজন সে কোন উত্তর দেয় না।

অপরাধীর মতো জড়তা নিয়ে মেঝো ভাই তার প্রস্তাবকে যুক্তি দিয়ে জোরালো করতে চায়, 'গাছ বেচাডা ছাড়া আর গতি কি ক'? ঐ হারামী মহাজনের কাছ আবারও ধার করবো?'

অতএব কাশেম বুঝতে পারে যে কাঁঠাল গাছটি বিক্রি হবেই। তবু সে কিছুটা কালক্ষেপণে প্রবৃত্ত হয়, 'শামসুক শুধ করে দেহো। আমিও খানটেক ভাবে লহৈ।'

'ভাবেক। তা'লি পর দেরি করিল নে যেন।'

'নাহ্। কইল বিকিলেই জানাবোনে।'

আলোচনা শেষ হবার একটু পরেই মাগরেবের আজানা পড়ে। কুয়োতলায় ওজু করতে যায় কাশেম। পশ্চিমে গোরস্থানের কাঁঠালগাছটি শূন্যে উঠেছে; শূন্যে উঠে শামসুর ঘরের টিনের চালের কিছুটা ওপর থেকে ছড়িয়েছে তার শাখা - প্রশাখা। ঘরটির চাল অতিক্রম করে উঠোনের কিছু অংশ পর্যন্ত চলে এসেছে সবুজ পাতার রাজ্য। যেন গাছের কোলে বসে আছে শামসুর ঘর! ওজু করতে করতে কাশেম তার মৃত মা'র মুখটিকে কল্পনায় দেখতে সচেষ্ট হয়। দুধে আলতা রঙের নূরুন্নাহার যেন গাঢ় নীল শাড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে গোরস্থানের পাশে খড়ের পালার নীচে! নীল শাড়ি কেন? কবে যেন কে বলেছিল, নীল রঙের শাড়ি মা খুব পছন্দ করতো! কে বলেছিলো? বড়বু নাকি আব্বা নাকি অন্য কেউ? খড়ের পালার নীচে দাঁড়িয়ে মা যেন চিরুনি দিয়ে দীঘল মোটা গোছের কালো চুল আঁচড়াচ্ছে আর কাকে যেন ধমক দিচ্ছে। কাকে? বড় ভাই নাকি ভয়ানক চঞ্চল ছিলেন। আহা! না জানি কত মমতায় মা জড়িয়ে রেখেছিলো তাদের। কাশেম এখন প্রায়শই নীরবে লক্ষ্য করে, কিভাবে তার স্ত্রী চারটি ছেলেমেয়েকে আগলে রাখছে প্রতিটি ক্ষণ; নাওয়া - খাওয়া ভুলে যাচ্ছে; তার বিশ্রামের সময় হয়ে অসাছে বড় সংক্ষিপ্ত। পাখির চিন্তনে কেবলই সন্তানদের বরাভয়। কাশেম সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভীষণ অন্তর্মুখী এক হাহাকার দৌড়ে বেড়ায় যোজন যোজন ধানের ক্ষেতে, দিগন্তের সবু সেই রেখার ওপরে; তারপর উঠে যায় ভূমি থেকে দূরের আকাশে যেখানে মেঘদলকে পর্বতশ্রেণী বলে ভ্রম হয়। এখন ওজুর ফাঁকে কাশেমের আবেগ পরিণত হচ্ছে গোপন অথচ অবাধ্য অশ্রুতে। বদনার জল করতলে ঢেলে বার বার সে চোখের কোণে ঝাপটা দেয়। আধো অন্ধকারে কাঁঠাল গাছের কালো কালো পাতা ঈষৎ বাতাসে কাঁপছে। কম্পনে জাগছে সর সর শব্দ। কে যেন তাকে ডাকছে মায়াভরে! কে?

ঘরে সন্ধ্যাবাতি দিয়েছে পাখি। কুপির ক্ষীণ আলোর রেখা বেড়ার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে মাটি লেপা বারান্দার উপর। কাশেম মাগরেবের নামাজ পড়ছে। মোনাজাতের জন্য হাত তুলে একসময় দুই করতল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে কাসেম আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে, পরলোকে মা যেন সুখে থাকে; যেন জন্নাতবাসী হয়!

বাবুর দোকানে সেই কিল, সেই কুদ্দুস, সেই রফিক দোকানের সামনের চরাটে বসে আছে। আড্ডা চলছে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে। খুনসুটি, বাঁকা কথা, আদিরসের গল্প-ঘন হচ্ছে এসবও। জমিস তেমনই গুড়গুড় করে হুঁকো টেনে চলেছে। প্রতিটি টানের সাথে হুঁকোর মুখে আগুন উস্কে উঠেছে আগের মতো। কিন্তু আড্ডাতে আজ কাশেমের মনে নেই। থানা শহরের নতুন সিনেমা হলের গল্প করেছে কুদ্দুস, 'বুঝলু কাশেম! ইকাব্বর হাজী হল বানায়ছে একখেন! জায়গা তো এক বিঘা হবিই! দরজার ফাঁক দিয়ে আলোও ঢোকে না। এই কামখেন খুব ভালো করেছে।'

'নতুন নতুন ওম্বাই হয়! কয়দিন পর দেখবু, দশ দিক থেন পর্দার পর আলো আসে পড়তেছে।' আলোচনায় আগ্রহ নই কাশেমের। তাই একটু বলেই চুপ হয়ে যায় সে।

ইকাব্বার হাজীর সাফল্যে রফিক ঈর্ষান্বিত, 'দুই নম্বরী কাম করে শালা ট্যাকাও করেছে! ট্যাকা থাকলি আমিও একখানে হল বানাতেম।'

রফিকের মন্তব্যের সূত্র ধরে আবার আড্ডা গুঞ্জরিত হতে থাকে। সেখানে কাশেম কেবল বিড়ি টানে চুপচাপ। তাকে গুঁতো মেরে নচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে নিজাম জেলে, 'কি হয়েছে রে তোর?'

'মনডা ভালো নেইরে ভাই!'

'ক্যা! কি হলে আবার?'

'জলির বিয়ে সম্বন্ধ আয়ছেয'

জলির বিয়ে সংক্রান্ত এই একটি বাক্য উকিলের কান এড়ায় না এবং কথাটি ঝটিতি আড্ডায় সার্বজনীন হয়ে পড়ে। নানা কথার দাপাদাপিতে হারিয়ে যায় নিজাম জেলের মন্তব্য, 'তা ভালোই হয়েছে।' এবং কাঁঠাল গাছ বিক্রির সম্ভাবনার কারণে অস্থিরতাও কাশেম তাব বন্ধুদের কাছে মুক্ত করতে পারে না

কাশেম অবশেষে আড্ডা থেকে উঠে পড়ে। এত জলদি সে সচরাচর ওঠে না। বাড়ির দিকে না গিয়ে সে খালপাড় দিয়ে নদীর ধারা লক্ষ্য করে এগোয়। রহমানদের ঘাটে শিমূলগাছের শিকড়ের ওপর নির্জনতায় বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে কাশেম। শুক্লপক্ষের চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে শূণ্য হয়ে যাবে আর চার-পাঁচ দিন পর। নদীর ওপারে ধানের ক্ষেতগুলো আবছায়া। আর নদীর জলে চাঁদের আঁকাবাঁকা ছবি। অনুজ্বল আলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে প্রশস্ত কোন খেয়ানৌকা। নৌকার পাটাতনে দাঁড় করানো একটি মটর সাইকেল এবং তার পাশে দীর্ঘদেহী একজন মানুষের অস্পষ্ট উপস্থিতি। অর্থাৎ দূরের কোথাও থেকে বাড়ি ফিরছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান সাহেবকে বলে কৃষি মেঝো ভাইকে ধার হিসেবে কৃষিঋণ নিলে কেমন হয়? কাশেম ভাবছে, সেই টাকা মেঝো ভাইকে ধার হিসেবে দিলে মেঝো ভাই তা নিতে পারে। এতে করে যদি কাঁঠালগাছটি মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়! অগ্রহায়ণ মাসে ইরি দান উঠবার পর মেঝো ভাই না হয় সে পরিমাণ টাকা শোধ করে দিলো! কিন্তু আরও এক-দুই হাজার টাকার ঋণের ভার কিভাবে গ্রহণ করবে কাশেম অথবা মেজো ভাই? কাজেই বালখিল্য পরিকল্পনার কোন সুযোগ এখানে নেই। অতএব করাতীরা প্রায় দেড় গজ ব্যাসের কাঁঠাল গাছটি কেটেই ফেলবে। প্রথমে দেহ থেকে আলগা হয়ে যাবে গাছের শাখাগুলো। পাতাশুদ্ধ শাখাগুলো মাটিতে পড়লে ঝুপ করে আওয়াজ উঠবে। গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে বিভিন্ন আকারের হালকা হলুদ মাংসপিন্ড। আর গাছটি বীভৎস অন্তহীনতায় দাঁড়িয়ে থেকে তখন যে আর্তচিৎকার করছে, 'আমাকে তোরা বাঁচা কাশেম!' দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে কাশেম নদীর পার থেকে উঠে পড়ে এবং হনহন করে যাত্রা করে বাড়ির দিকে। সুফুরার বাঁশবাগান অতিক্রম করবার সময় কেটে নেওয়া বাঁশের উদগত গুড়ির সাথে হোঁচট আচমকা সে ভূমিতে

হুমড়ি খায়। ডান হাতের করতালের চাপে মুড়মুড় শব্দে ভেঙে যায় একটি মৃত শামুকের খোলস। খণ্ডিত খোলসের ধারে ছিঁড়ে যায় তার ত্বক।

রাতের বেলায় সাধারণতঃ ঘরের বারান্দাতেই ঘুমিয়ে থাকে শামসু। বাড়িতে ঢুকে দেখা গেলো, শামসু তার ঘরের বারান্দা থেকে চৌকি নামিয়ে এনেছে উঠোনে। তার পাশে ঘুমোচ্ছে ছোট দু'জন ছেলে। মাথার কাছে বসে তালপাখা দিয়ে তাদের বাতাস করছিলো শামসুর স্ত্রী। কাশেমকে এগিয়ে আসতে দেখে অন্ধকারেই সে ঘোমটা টানলো এবং উঠে ঘরে চলে গেলো। শামসু শুয়ে থেকেই কাশেমকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোনে গেছিলু? বাবুর দুকানে তোক দেখলেম না।'

'নদীর ধারে হাঁটপের গেছিলেম। গরমও যা পড়েছে।'

'হয় রে! ভাদ্দর মাসেই গরমই আলাদা।'

তারপর কাশেম ফিসফিসিয়ে শামসুকে জিজ্ঞাসা করে, 'জলির বিয়ের কথা মেঝো ভাই তোক কিছু কয়ছে?'

'ঐ এজমালি কাঁঠাল গাছখেন বেচার কথা কলে আর কি!' শামসুর কথায় মেঝো ভাইয়ের প্রস্তাবে সমর্থনেরই সুর। একটু থেমে সে যোগ করে, 'মিয়েডার বিয়ে তো দেওয়াই লাগিবি! কবে তো সোমস্ত হয়েছে।'

সেই ফিসফিসিয়েই আবার কাশেম তার সংশয় প্রকাশ করে, 'কিন্তুক এ্যাম্বা সরেস গাছ বেচাডা কি কুনো কামের কথা? আইজ বাদে কাইল এই গাছের দাম কত হবি তুইই ক?'

'তা তুই ঠিকই কইছিস।' শামসু এবার দ্বিধান্বিত।

'যাই হোক তুই ভাবে দেখেক।'

'সেই ভালো! কইল বিকেলে তো কথাই হবিনি।'

হাতপাখা তুলে নিয়ে সামসু তার ঘুমন্ত ছেলেদের বাতাস দিতে থাকে। কাশেম গিয়ে ঢোকে নিজের ঘরে। হারিকেনের আলোয় ঘরের একপাশে বড়ো একটি চৌকিতে চৌদ্দ থেকে চার বছর বয়সের তিনজন ছেলেমেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা যায়। আর অন্যপাশে একজন দুধের বাচ্চাকে কোলের ওমে নিয়ে আঘোরে ঘুমোচ্ছে পাখি। পাখিকে জাগানো প্রয়োজন। মা এবং কাঁঠাল গাছটির নিবিড় সম্পর্কটি সম্বন্ধে শামসুকেও কিছু বলা হলো না। বড়ো ভাই এবং মেঝো ভাইয়ের সঙ্গে মানসিক দূরত্বের অভ্যস্ততার কারণে তাদেরকেও বলা সম্ভব নয় যে মা'র কবরের শিয়ানের কাঁঠাল গাছটিতে অবশ্যই মা'র শরীরের অংশ আছে। পাখিকে সব জানতে হবে। তা'ছাড়া স্ত্রীর পরামর্শও তার চাই। তারপর মেয়েটির পিঠে ক'বার করাঘাত পড়ে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে কাশেম তাকে ডাকে, 'পাখি! এই পাখি! ওঠেক!'

পাখি অসম্বিতে লাফিয়ে ওঠে 'কি? কি হয়েছে?' 'দূর পাগল। কিছু লয়।'

—এই বলে একচোট হেসে তাকে শান্ত করে কাশেম। বিছানা থেকে নেমে পাখি জিজ্ঞাসা করে, 'কহন আলো?'

কাশেম জানায়, 'কেবলই।'

হেঁসেলে ঢুকে পাখি কুপি জ্বালে; স্বামীর পাতে বেড়ে দেয় হাঁড়িকুড়িতে ঢেকে রাখা জুড়িয়ে যাওয়া ভাত - তরকারি। কাশেম গলা নামিয়ে কথা শুরু করে কেননা মেঝো ভাইয়ের ঘরের কাছেই তার হেঁসেলঘর। সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার! পাখির সম্মুখে সে প্রশ্ন তোলে, 'জলির বিয়ে বিষয়ে মেঝো ভাবী তোমাকে কিছু কয়ছে?'

'কলে তো যে আশ্বিনের মাঝামাঝি বিয়ের তারিখ ফেলার জন্যি বদর মোল্লা চাপ দেচ্ছে। মেঝো ভাই কচ্ছে অঘ্রাণ মাসে বিয়ের কথা। মনে কয়, বদর মোল্লা তা মানবি না নে।'

জলির বিয়ে নিয়ে আরও তথ্য দিতে ব্যাপৃত হলে কাশেম তাকে থামায়, 'গোরস্থানের কাঁঠাল গাছখেন বেচার কথা কিছু হয়য়ে নাকি?'

'বড় ভাই মত দেছে। এখন তুমি আর শামসু ভাই মত দিলিই হয়।'

'তা তুমি কি কও?'

'গাছডা বেচলি তো ভালোই হয়! দুই বর্ষা ধরে চাইল দে ঘরের মধ্যি পানি পড়তেছে। আইজ হোক কাইল হোক চাইল সারার জন্যি গুটা তিনেক টিন তো কিনাই লাগবিনি!'

অকস্মাৎ এমন পার্থিব বিষয় আলোচনায় চলে আসবে তা কাশেম মোটেই ভাবেনি। কাজেই সে খাওয়া ফেলে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে, 'আমি কি কঈ আ আমার সারিন্দা কি বোঝে! কঈ, গাছপালা সব বেচে ফেল্লি পরে চলবিনি কি করে?'

পাখিও ঝাঁঝিয়ে ওঠে সমান তালে, 'এহন গাছ গাছ করে পাগল হইছেও! ক্যা আর বছর যে সরেস মেহেগনিখেন বেচে ট্যাকা উড়া দিলে তখন কি আর একখেন চাপা পুতিছিলো?

না। কার্তিক মেহগনির জায়গাতে কাশেম কোন চারা লাগায়নি। কিন্তু পথ খোঁজার আলোচনা ক্রমশ ঝগড়াঝাটির দিকে এগুচ্ছে। কাজেই কথা বাড়িয়ে ফল কি? বড় অভিমান হয় পাখির ওপর। রাতের খাবার অসম্পূর্ণ রেখেই কাশেম ভরা থালা গ্লাস উল্টে উঠে যায়। গজগজ করতে করতে পাখি গিয়ে শুয়ে পড়ে। বারান্দায় একটি পাই পেতে শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানতে থাকে কাশেম। আজ সে ঘরেই ঢুকবে না। হালকা জ্যোৎস্নায় গম্ভীর মুখে দাঁয়িয়ে থাকা কাঁঠাল গাছটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে মা'র কথা ভাবছে।

দুর্ভাবনা এবং ফুলকি ছোটা মেজাজ মাথায় নিয়েও রাতে ঘুম ভালোই হলো। প্রভাতে এখন বাড়ি জেগে উঠেছে। চার ভাইয়ের চারটি হেঁসেল ব্যস্ত। সেখানে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে হাঁড়ি, চামচ ইত্যাদির ঠুকঠাক এবং উনুনের আঁচের একটানা একঘেঁয়ে শব্দের সম্মিলন। গাত্রোত্থানের পর কাশেম মুখ-হাত ধুতে যায় কুয়োতলায়। বালতি থেকে আঁজলা ভরে মুখে জল ছিটাতে ছিটাতে সামনে তাকালে দেখা যায়, অদূরের কাঁঠাল গাছের তলায় কোন নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কে? কে ওখানে? সমস্ত স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা অকস্মাৎ থমকে যায়। মা নাকি? বিভ্রম কাটলে চোখে পড়ে, ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে একমনে দাঁতের ধারে নখ খুঁটছে জলি। কিশোরীর মুখমন্ডল ভূমিতে আনত। তারপর ঝাঁটা দিতে দিতে জলি চলে আসে উঠোনের মাঝামাঝি। কাশেম

গিয়ে গোরস্থানের পাশে দাঁড়ায়। অনেক আগে আব্বা পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে গোরস্থানটি ঘিরে দিয়েছিলো। সেই দেয়ালের পশ্চিম আর দক্ষিণের অংশ পুরোটাই ভেঙে পড়েছে সময়ের সাথে। দেয়ালের অবশিষ্ট অংশ দু'টি সুবিপুল ক্ষয় নিয়ে জেগে আছে প্রায় হাঁটু সমান উচ্চতায়। নীচু দেয়ালের সাথে দাঁড়িয়ে কাশেম গোরস্থানের মাটিতে তাকিয়ে থাকে। ঐখানে কাঁঠাল গাছটির নীচেই তার মা'র কবর। বছর তিরিশ আগে মা'র কলেরা হয়েছিলো। দশগ্রামের নামকরা জনৈক কবিরাজ চিকিৎসা করেছিলো বটে। তবু পাঁচদিনের মাথাতেই মরে গেলো মা। কত মানুষেরই তো আজকাল কলেরা হয়। আধুনিক চিকিৎসার গুনে তারা আবার ভালোও হয়ে যায়। অথচ মা'র অসুখের সময় এই থানাতে আধুনিক চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিলো না; থাকতে পারতো। আর অসময়ে মৃত্যুর কারণে কাশেমের মস্তিস্কে মা'র স্মৃতির তেমন কোন সঞ্চয়ও রইলো না। স্মৃতিও তো মানুষের সময়গুলোকে মহিমা দেয়! যে গাছটিতে এতদিন মৃত মা'র প্রতিনিধি বলে মনে হয়েছেও, আপন হিসেবে জেনেছে, তাকেও এখন উপড়ে ফেলবে কঠোর দারিদ্র।

সারা দিন পর ক্ষেত থেকে ফিরে চার ভাই বসলো পূর্বনির্ধারিত আলোচনায়। এবার কাশেম ছাড়া অন্য তিনজন কাঁঠাল গাছ বিক্রি পক্ষে। কাশেম কেবল বলেই চলেছে যে জলির বিয়ের খরচ চালাবার জন্য বিকল্প কোন পথ বের করা যায় কিনা। একই কথার পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে পড়ে সবাই। মেঝো ভাই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'তালি পরে তুই কি চাস, বিয়েডা ভাঙে যাক?'

কাশেমও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, 'আমি অত বড় সীমার লয়। জলিক আমি তোমারে কারোর থেন কম আদর করি নেকি?'

মেঝো ভাই নিঃশ্চুপ। বড়ভাই আর শামসু নেমেছে মধ্যস্থায়। কিন্তু এবারও কাউকেই কাশেম বলতে পারলো না গাছটির উপর তার ভয়নক দুর্বলতার কথা; বলতে পারলো না যে গাছটির অবর্তমানে মাতৃহীনতার কোন সান্ত্বনা তার আর থাকবে না। এদিকে যেহেতু গাছ বিক্রি করতে তিন ভাই একমত কাজেই শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই যৌথতার কাছে তার আত্মসমর্পণ করতেই হবে। কাশেম তাইই করলো।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেলো। আজ আড্ডায় যেতে কাশেমের ভালো লাগছে না। ঘরের বারান্দায় পাটিতে সে চুপচাপ শুয়ে আছে চোখ বুঁজে। এই বারান্দায় শুয়ে বসে দুর থেকে কতদিন সে কাঁঠাল গাছটির সাথে নিঃশব্দে ভাব বিনিময় করছে।

'ও লক্ষ্মী-পক্ষী গাছ। আমার মা ক্যাম্বা' আছে?' কাঁঠাল গাছের পাতা যদি দুলে উঠেছে তবে বুঝতে হবে যে পরলোকে ভালো আছে মা।

কোনদিন গাছটি কাশেমের ডাকে সাড়া দেয় না। গাছের পাতারা নিথর, নিঃশ্চুপ। অর্থাৎ মা ভালো নেই। কাশেম তখন নামাজে বসে মৃত মা'র সুখের জন্য দোয়া করেছে; কখনও পড়েছে বাড়তি নফল নামাজ।

বর্ষাকাল এলো। আঙিনায় বেড়াতে এলো নতুন নতুন পাতারা। বৃষ্টিপতনে পাতারা নাচলো। ঝোড়ো বাতাসের সাথে তারা পা মিলিয়ে দুললো। তখন 'ও লক্ষ্মী-পক্ষী গাছ। ক্যাম্বা আছে আমার মা?'

'ভালো। খুব ভালো।'

একবার প্রবল জড়ে ভেঙে পড়েছিলো কাঁঠাল গাছটির একটি মোটা ডাল। 'ও সোনার গাছ। খুব কষ্ট হচ্ছে মোর?' কাশেম ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেছিলো।

'হয় গো! খুব কষ্ট!'

কাশেম তখন তার শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়েছে। সেই প্রিয় কাঁঠাল গাছ এবার মারা যাবে। তাকে তবে আর বাঁচানো গেলো না।

অনিদ্রায় ভরে ছিলো রাতের প্রহরগুলো। কুয়োতলায় মুখ-হাত ধুয়ে কাশেম গোরস্থানের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মা'র কবরের শিথানের কাঁঠাল গাছটির অমসৃণ শরীরে শেষবারের মতো হাত বুলিয়ে সে আদর করে; অনুচ্চারে গাছের সাথে কথা বলে, 'ও লক্ষ্মী-পক্ষী গাছ তুমি ভালো থায়য়ো। মা'ক কয়ো, মা'ও যেন ভালো থাহে; মন যিন খারাপ না করে।'

তারপর সকালের খাবার খেয়ে ইরিক্ষেতের পরিচর্যায় সে বেরিয়ে যায়। পরম আত্মীয়কে সে রেখে এলো বধ্যভূমিতে। গ্রামের হালট ছাড়িয়ে, নদীর হাঁটুজল পেরিয়ে সে ওপারে যাবে। ওখানেই বড় দাগে তার ধানের ক্ষেত। কিন্তু কাশেমের শরীর সচলতার নিয়ম যেন ভুলে গেছে! তাই জমিতে সার ছিটাবার জরুরী দায়িত্ব অস্বীকার করে চলার গতি হয় ধীর। এছাড়া তার চোখ সজল। পথও আবছা। সময় চলে যায়। ক্ষেতের দিকে অপরিণামদর্শীর কোন যত্নই নেই আজ। ছুঁয়েও দেখা হয় না গামছায় বেঁধে আনা ভাত আর করলার চচ্চরি। একের পর এক বিড়ি শেষ হয় আর অন্ত্র জ্বলতে থাকে অনিয়মে। হঠাৎ দুপুরে কানা মেঘ ডেকে আনে রিমঝিম বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভেজায় তখন কোন উল্লাস নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাশেমের বিচলন লক্ষ্য করে জ্ঞাতি গোষ্ঠী, পাড়া-পড়শীরা। অতঃপর যুগপৎ অস্বস্তির অনুসরণ এবং উদাসীনতার অভিনয়।

বিষন্নতা নিয়েই বিকেলে বাড়ি ফেরে কাশেম। কাঁঠাল গাছটি ততক্ষণে কাটা হয়ে গেছে। গেছে করাতীরাও। গাছের ক'টা ডাল পড়ে আছে গোরস্থানের এপাশে মাটির ওপর। কাঁঠাল পাতার লোভে সেখানে ভিড় জমিয়েছে বাড়ির ছাগলগুলো। তারা কুৎসিতভাবে পাতা চিবোচ্ছে অবিরত এবং অজস্র খাবারের সমারোহ দেখে থেকে থেকে মহানন্দে ব্যা ব্যা করে জুড়ে দিচ্ছে চিৎকার। কেমন বিসদৃশ লাগছে বৃক্ষহীন এই পরিবেশ। ভেজা লুঙ্গি তারে মেলে দিয়ে কাশেম দ্রুত ঘরে ঢোকে। বিছানায় শুয়ে ছোট সন্তানটিকে মাই দিচ্ছে পাখি। পাখির কাছে জানা গোলো, জলির বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। অবাক হয়ে তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে কাশেম। এই একটু আগেই বদর মোল্লা এসে মেঝো ভাইকে জানিয়ে দিয়েছে, জলির মতো গেছো মেয়ের সাথে কিছুতেই তার সুলক্ষণ ছেলের বিয়ে দেবে না।

চৌদ্দ বছরের সোমত্ত মেয়ে যে এখনও তেঁতুল গাছ, পেয়ারা গাছ করে বেড়ায় তা বেহাযাপনা ছাড়া আর কি? বদর মোল্লার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নিয়ে কাশেম কোন কথাই বলে না। মাটিতে হেলান দিয়ে চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকে পর্যুদস্ত মানুষ।